বাংলাদেশের অ্যাকশন ধারার চলচ্চিত্রে রাষ্ট্র ধারণা নির্মাণ

নন্দিতা তাবাসসুম খান*
তপন মাহমুদ**

[**সার-সংক্ষেপঃ** পৃথিবীজুড়ে সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে, উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জন্ম নিয়েছে 'থার্ড সিনেমা'। কোন কোন দেশ বাণিজ্যিক ধারার চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়েই নিজের জাতি, জাতিসত্ত্বা ও সংস্কৃতির নির্মাণ করেছে, যার মধ্য দিয়ে মূলত ফুটে উঠেছে রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি তথা রাষ্ট্র ধারণা। বাংলাদেশে বানিজ্যিক ধারার একটা বড় জায়গা জুড়ে আছে অ্যাকশান ধারার চলচ্চিত্র। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পট পরিবর্তন এ ধরণের চলচ্চিত্রে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং তাতে জাতীয় পরিচিতি কীভাবে নির্মিত হয়েছে, সেটা খুঁজে দেখাই এ গবেষানর মূল উদ্দেশ্য। আর এ ক্ষেত্রে বিশ্লেষনের একক হিসেবে নেয়া হয়েছে রাষ্ট্র, জাতি, জাতীয়তা ও উপনেবিশিকতার ধারণার উপর ভিত্তি করে নির্মিত জাতীয় পরিচিতি। জাতি, জাতীয়তা, জাতীয় সংস্কৃতি, সর্বোপরি রাষ্ট্র ধারণা বিভিন্ন তত্ত্ব ও ধারণার আলোকে বিভন্ন দশকের তিনটি অ্যাকশান ধারার চলচ্চিত্র গুনগত আধেয় বিশ্লেষণ করা হযেছে। দেখা গেছে, গবেষণায় ব্যবহৃত চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রকে উপনিবেশিক রাষ্টের কাঠামোয় দেখানো হয়েছে যেখানে 'জাতি' এবং 'জাতি-রাষ্ট্র' দুটি বিচ্ছিন্ন প্রত্যয়। বস্তুত 'অকার্যকর' রাষ্ট্রের ধারণাই এইসব চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হয়, যেখানে রাষ্ট্রের অতীত গৌরব, ঐতিহ্য এবং সংহতি কার্যত অনুপস্থিত।]

নিয়ন্ত্রক শব্দসমূহঃ জাতি ও জাতীয়তা, জাতীয় সংস্কৃতি, রাষ্ট্র, উপনিবেশিকতা, থার্ড সিনেমা, জাতীয় চলচ্চিত্র, অ্যাকশন ধারার চলচ্চিত্র

ভূমিকাঃ

গণমাধ্যমের যেকোন টেক্সট নানান সংকেত এবং মোটিফের মধ্য দিয়ে অর্থ নির্মাণ করে। হল (১৯৯৭) বলছেন, এসব সংকেতে অর্থ আরোপ করে নির্দিষ্ট সংস্কৃতি; আবার

* **নন্দিতা তাবাসসুম খানঃ** জ্যেষ্ঠ প্রভাষক, মিডিয়া স্টাডিজ অ্যান্ড জার্নালিজম বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ।

** **তপন মাহমুদঃ** সহকারী অধ্যাপক, জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগ, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ।

এই অর্থকেই বিনির্মাণ করে সাহিত্য, নাটক, চলচ্চিত্র। সিনেমার জন্মের শুরুর দিকে এর কোন জাতীয় পরিচিতি ছিল না। তবে, এই সময়ে ফ্রান্স, জার্মানি রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশ হতে শুরু করে। ১৯২০ সালের দিকে চলচ্চিত্র নির্মাণে অনেকটা এগিয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্র। ধীরে ধীরে আধিপত্য বিস্তার করে হলিউড। তবে এই আধিপত্য বা মনোপলির বিপরীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বিভিন্ন দেশে জাতীয় চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু হয়।

ফিলিপ রোজেন (২০০৬) 'জাতীয় চলচ্চিত্র'-এর উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেন- ইতিহাস, জাতীয় পরিচিতি এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়বস্তুকে। আর সংস্কৃতি বিষয়ক তাত্ত্বিকরা জাতীয় সংস্কৃতির সংজ্ঞায়নে ইতিহাস, ঐতিহাসিক মিথ, সামাজিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ভাষা, রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইত্যাদি বিষয়সমূহের চর্চার বিষয়টি সম্পর্কে উল্লেখ করেন। এসব উপাদান ব্যক্তির সাংস্কৃতিক চরিত্র নির্মাণ করে। চলচ্চিত্রকে জাতীয় সাংস্কৃতিক মাধ্যম হিসেবে অধ্যয়ন করতে হলে এ সংস্কৃতি নির্মাণে চলচ্চিত্রের অবস্থান নির্ণয় প্রয়োজন। ঔপনিবেশিকতা বিরোধী তাত্ত্বিক ফ্যানন বলছেন, জাতীয় সংস্কৃতি কোন লোককথা নয়, আর না এটি কোন জাতির বৈশিষ্ট্যের দিক নির্দেশক (ফ্যানন, ১৯৬৩)। পাশাপাশি বেনেডিক্ট অ্যান্ডারসন 'জাতি' প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, 'জাতি'র জন্ম একটি সচেতন রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিতর দিয়ে নয় বরং কোন বৃহৎ সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোর ভেতর'।

এ ভূখণ্ড চলচ্চিত্রের পদার্পণের বয়সও একশ বছর পেরিয়েছে। মুখ ও মুখোশ (১৯৫৬)-এর মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে চলচ্চিত্র স্বীকৃতি পেলেও, ভারতীয় উপমহাদেশে চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু হয় হীরালাল সেনের হাত ধরে ১৮৯৮ সালে। তবে ১৯৫৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা (ইপিএফডিসি) প্রতিষ্ঠিত হলে এ গতি আরো ত্বরান্বিত হয়। ১৯৪৭ এর পর থেকেই এ ভূখণ্ডের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে নানান উত্থান-পতন ঘটে। পাশাপাশি উত্থান-পতন ঘটে আমাদের চলচ্চিত্রশিল্পেও। কিন্তু রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক এ দুই ধারাকে এক করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফ্র্যান্টজ ফ্যানন (১৯২৫) -এর বক্তব্যে আমরা খুঁজে পাই কীভাবে ঔপনিবেশিক চিন্তা একটি জাতিকে তার সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ভাষা আন্দোলন পরবর্তীসময়ে দেখা যায় উর্দু চলচ্চিত্রের তুমুল আলোড়ন; যার অধিকাংশের পরিচালক ছিলেন বাঙ্গালি। উর্দু চলচ্চিত্রের দর্শকদের আবার নিজস্ব সংস্কৃতিতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে লোককাহিনী নির্ভর চলচ্চিত্র; রূপবান (১৯৬৭)। কিন্তু সেখানে সংস্কৃতি নির্মাণ এবং বাণিজ্যিক স্বার্থ দাঁড়ায় মুখোমুখি। ১৯৬৭ সালে নির্মিত 'নবাব সিরাজউদ্দৌলা' এবং ১৯৭০ সালে নির্মিত 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্র দুটিতে খুঁজে পাওয়া যায় বেশ কিছু জাতীয় রাজনৈতিক উপাদান। চলচ্চিত্র এ পর্যায়ে এসে পৌঁছাতে রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে ঘটে গেছে ছয়দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান। স্বাধীনতা উত্তরপর্বে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের আধিক্য দেখা যায়। স্টপ জেনোসাইড (১৯৭১), ধীরে বহে মেঘনা (১৯৭৩), ওরা ১১

জন (১৯৭২), অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী (১৯৭২) চলচ্চিত্রসমূহ দর্শক ও সমালোচকদের মধ্যে সমাদৃত হয়। কিন্তু সত্তরের দশকে ব্যবসায়িকভাবে সবচেয়ে সফল চলচ্চিত্র ছিল রংবাজ (১৯৭৩) এবং সুজন সখি (১৯৭৪), (কাদের, ১৯৯৩,৩৬৯)।

গবেষণা প্রশ্ন

এ অধ্যয়ন কয়েকটি গবেষণা প্রশ্নকে সামনে রেখে এগিয়ে নেওয়া হয়েছে-

১. বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পট পরিবর্তন অ্যাকশন ধারার চলচ্চিত্রে কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে?
২. এ ধরণের চলচ্চিত্রে জাতীয় পরিচিতি কীভাবে নির্মিত হয়েছে?
৩. ঔপনিবেশিক প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসে কীভাবে রাষ্ট্র ধারণা নির্মাণ হয়েছে?

নমুনায়ন ও গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণায় নব্বই দশকের, বিশেষ করে এই দশকের দ্বিতীয়ার্ধে, বাণিজ্যিক ধারার চলচ্চিত্র হিসেবে নির্মিত অ্যাকশন জঁরার তিনটি চলচ্চিত্রকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়েছে। কারণ, ১৯৯০ এর দশকে অ্যাকশন ধারা বাংলাদেশের বানিজ্যিক সিনেমার প্রধান জঁরা হিসেবে আবির্ভূত হয়, বিশেষ করে নতুন দর্শন মাধ্যম হিসেবে আসা স্যাটেলাইট টেলিভিশন এবং ভিডিও মাধ্যমের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য'' (রাজু, ২০১৩)। আম্মাজান (১৯৯৯), শান্ত কেন মাস্তান (১৯৯৮) এবং মিথ্যার রাজা (১৯৯৬) এই তিনটি ছবির গুণগত আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

জাতি এবং জাতীয়তা

জাতি হচ্ছে প্রথমত একটি জনসমষ্টি বা কমিউনিটি। আকস্মিক বা ক্ষণস্থায়ী একত্রীভবনে কখনও জাতি হয়না, বরং তা হচ্ছে জনগণের একটা স্থায়ী জনসমষ্টি। তার একটা ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকতে হয়। জাতির প্রকৃতি নির্দেশক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হলো ভাষা। তবে এর অর্থ এই নয় যে, সব সময় ও সব জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভিন্ন ভাষায় কথা বলে, কিংবা যারা একই ভাষায় কথা বলে, তারা অবশ্যম্ভাবীরূপে একই জাতি গঠন করবে। তবে ভাষা ও সাধারণ ভূখণ্ড জাতি গঠনের জন্য যথেষ্ঠ নয়। জে ভি স্তালিন তার জাতি সমস্যা সম্পর্কে দেয়া রিপোর্টে বলেন, "সাধারণ ভূখণ্ড থাকলেই জাতি সৃষ্টি হয় না। তার সাথে জাতির বিভিন্ন অংশগুলোকে একটি একক সমগ্রত্বের মধ্যে গ্রথিত করার জন্য এক অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক বন্ধনের আবশ্যকতা রয়েছে ।...পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট ছাড়াও, জাতি গঠনকারী জনগণের নির্দিষ্ট আত্মিক গঠনকেও অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। এর মধ্য দিয়েই গড়ে উঠে জাতীয় চরিত্র, যা জাতীয় সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যবোধক বিশেষত্বের মধ্যে প্রকাশিত হয়। এ জাতীয় পরিচয়ের বোধ

থেকেই জন্ম নেয় জাতীয়তাবোধ বা জাতীয়তাবাদ। আর জাতীয়বাদী লড়াই থেকেই আমরা জন্ম নিতে দেখি জাতিরাষ্ট্র। যদিও বেনিডিক্ট অ্যান্ডারসন (উদ্বৃত, হক, ভৌমিক: ২০১৪) জাতিরাষ্ট্রের ধারণাকে কল্পিত সংঘ (ইমাজিনড কমিউনিটি) হিসেবে দেখেছেন। তিনি বলেন, ''জাতি একটি কল্পিত রাজনৈতিক সংঘ, যাকে একই সাথে সীমাবদ্ধ ও সার্বভৌম ধরা হয়। এটি কল্পিত, কারণ ক্ষুদ্রতম জনগোষ্ঠীর জাতিতেও এর সব সদস্য সবাইকে চেনে না, তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয় না, এমনকি পরস্পরের ব্যপারে কখনও শোনেও না। অথচ একক সংঘের ছবি মনে রেখে তারা জীবন যাপন করে।''

তবে জাতীয়তাবাদের সাথে রাষ্ট্রের বা রাজনীতির সম্পর্কটা অধিক। কাগজে কলমে এই ধারণাটির শুরু অষ্টাদশ শতাব্দিতে। এ সময় মানুষ বড় পরসিরে নিজেদের পরিচয় নির্মাণ করতে চাইলো। ১৮২১ সালে গ্রিসে অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে গ্রিক জাতীয়তাবাদীরা স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করে। তবে জাতীয়তাবাদের ধারণা সবার নজরে আসে ফরাসী বিপ্লবের পর। "জাতীয়তাবাদী চেতনার পেছনকার বড় ঘটনা হচ্ছে দুটি আপত বিরোধী আকাঙ্ক্ষা। একটি আত্মপরিচয়ের, অপরটি সমষ্টিগত ঐক্যের" (চৌধুরী: ২০১১)। প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন নিজের পারিবারিক ও বংশগত বা গোষ্ঠীগত পরিচয় আছে, তেমনি এর বাইরেও সে একটা সমষ্টিগত পরিচয় বোধ করে, বিশেষ করে যখন সে ভিনদেশীদের পাশে নিজেকে দাঁড় করায়। সমষ্টিগত পরিচয়ের এই জায়গা থেকেই দেখা যায়, এই জাতীয়তাবাদী চেতনাকে কেউ তার আধিপত্যবাদের জন্য কাজে লাগাচ্ছে, আবার কেউ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য।

বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয় নির্ধারণ বা এর রূপ নির্নয় করতে গেলে এর ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতাকে বিচেনায় আনতে হবে। বাংলাদেশের জাতিসত্তার মাঝে বিভিন্ন পরিচয়ের ধারা খুঁজে পাওয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর মতো যারা একটা সময় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কথা ভাবতেন, তারাই দেখি ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের বিরোধীতার জায়গায় বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন। আবার এই সময়কালেই দেখা যায় মুসলিম লীগ সৃষ্টি ও তার মধ্য দিয়ে মুসলিম জাতীয়তাবাদী রাজনীতির শুরু হয়। এর ফলে "বাঙালি মুসলমানরা তাদের আত্মপরিচয় বা সাংস্কৃতিক পরিচয় নিয়ে দ্বিধায় পড়ে। তারা আসলে কি ? বাঙালি নাকি মুসলমান।" (সালাউদ্দিন, ২০০০)।

১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হলো। জন্ম নিলো ভারত-পাকিস্তান। ভারতের দুই পাশে প্রায় ১২০০ কিলোমিটার দূরত্বে পাকিস্তানের দুই অংশ। এদের মধ্যে একটা মিল ছিল, ধর্ম। পাকিস্তান সৃষ্টির পরেই বাংলা ভাষার উপর আগ্রাসন শুরু করে পাকিস্তান সরকার। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ মোড় নেয় বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী লড়াইয়ে। বাঙালি মুসলমানরা বুঝতে পারে ধর্মের মিল থাকলেও সাংস্কৃতিকভাবে তারা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অনেক আলাদা। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের এই সময়টাকে বলা যায় বাঙালি জাতীয়তাবাদের নতুন উন্মেষ পর্ব। একই সাথে চলে

পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণ ও শাসন। এর বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াই ও নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে বাংলাদেশ। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্রের জন্ম হলো, ১৯৭২ সালের সংবিধানে তা রূপ নিলো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে। তবে সংকট থেকে গেল বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে পাশ কাটিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সংবিধানের মূল নীতি করায়। পরবর্তীসময়ে এটি পরিবর্তন করে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ করা হলো বটে, তবে বাঙালি ছাড়া অন্যান্য জাতিসত্তা সম-অধিকার পায়নি তার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রকাশ ও পালনে। আবার একই সাথে আমরা দেখি ১৯৭২ সালের সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা বিলুপ্ত করে ১৯৭৫ পরবর্তীসময়ে সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান সংবিধানের শুরুতে " বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম যুক্ত করে এবং পরবর্তীকালে আরেক সামরিক শাসক এরশাদ রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে সংবিধানে ইসলামকে স্বীকৃতি দেয়। সবশেষ আমরা সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে দেখি বাংলাদেশের সংবিধানে যেমন ধর্মনিরপেক্ষতা ফিরিয়ে আনা হয়েছে, কিন্তু একই সাথে বলা আছে রাষ্ট্রধর্ম হচ্ছে ইসলাম।

এখন বাংলাদেশ নামের রাষ্ট্র, একটা এতিহাসিক ধারাবাহিকতায় যার জন্ম, তার জাতীয় পরিচয় বা জাতীয় সংস্কৃতি তহলে কি? বাংলাদেশের বা এই ভূখণ্ডের অতীত খুঁজলে পাওয়া যাবে, সনাতন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন, লোক ধর্মসমূহ, পীর-আউলিয়াদের হাত ধরে ইসলামের প্রবেশ ও প্রভাব, সুফিবাদ, বৈষ্ণববাদ, বাউল দর্শন ও চর্চার মতো অনকে বিষয়। একই ভূখণ্ডে এই বিষয়গুলো আমাদের জাতীয় চরিত্র তৈরিতে যেমন বিস্তর প্রভাব ফেলেছে, তেমনি বিভেদের রেখাও জোরালো করেছে কখনও কখনও। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ও বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব পালনে সর্বজনীনতা যেমন দেখা যায়, তেমনি ধর্মকে ঘিরে সংঘাতও হতে দেখা যায়। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের জন্ম হলেও বৈষম্য আজও রয়ে গেছে। প্রতিষ্ঠা হয়নি রাজনৈতিক ও আইনের শাসন। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক দল একত্র হয়ে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলেও সেই গণতন্ত্র এখন অধরাই মনে করেন অধিকাংশ মানুষ। "২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে জন্ম নেয়া শাহবাগ আন্দোলনের কারণে মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে জন্ম নেয়া বাঙ্গালিত্ব ও মুসলমানিত্বের লড়াই চার দশক পর পুনরায় একই আকারে ফিরে এসেছে" (হক, ভৌমিক: ২০১৪)।

জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র গবেষক জাকির হোসেন রাজু (২০০৩) জাতীয় চলচ্চিত্রে 'জাতি' প্রত্যয়টির ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন, কোনো জনগোষ্ঠীর 'জাতি' এবং 'জাতীয়তা' নির্ণয়ের সমস্যাটির ওপর আশির দশকের প্রথম দিকে বেনেডিক্ট এন্ডারসন এবং আরও

কয়েকজন বোদ্ধা আলোকপাত করেন। তাঁদের ব্যাখ্যায় চারটি ভিন্ন ধারা আমাদের চোখে পড়ে।

ক. মৌল সত্তাবাদী

খ. তৃতীয় বিশ্ববাদী

গ. ইউরোপীয় চলচ্চিত্র মডেল

ঘ. উত্তর উপনিবেশবাদী

এর মধ্যে মৌল সত্তাবাদী ধারাটি পশ্চিমা বা প্রথম বিশ্বের অবস্থা থেকে 'জাতি' বলতে রাজনৈতিকভাবে নিরূপিত একটি সত্তাকে বোঝে। এই ধারার কাছে জাতি এবং রাষ্ট্র সমার্থক। রাজু উল্লেখ করছেন, ফিলিপ রোজেন এবং মাইকেল ওয়ালস রাষ্ট্র এবং জাতির পার্থক্য নিরূপণ করতে আলথুসারীয় নিপীড়নবাদী এবং দর্শন ভিত্তিক রাষ্ট্র যন্ত্রের বিভাজনের সহায়তা নিয়েছেন। এসেনশিয়ালিস্ট বা মৌল সত্তাবাদী লেখকরা যখন জাতীয় চলচ্চিত্রকে পাঠ করেন তখন তা হয়ে পড়ে কেবল রাজনৈতিকভাবে সীমাবদ্ধ একটি ভূখণ্ডে উৎপন্ন চলচ্চিত্রের ইতিহাস।

মৌল সত্তাবাদী ধারা একটি 'জাতি'-র অস্তিত্বকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করে এবং এরপর ঐ নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে উৎপন্ন সব চলচ্চিত্রে সেই 'জাতীয়' বৈশিষ্ট্যটি আরোপ করে।

তৃতীয় বিশ্ববাদী পণ্ডিতদের কাছে 'জাতি' ঔপনিবেশিকতার কবল থেকে মুক্ত একটি বহমান সাংস্কৃতিক সত্তা। একটি জাতির ভেতরে বিদ্যমান এবং পরস্পর সংগ্রামরত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সত্তাসমূহের স্থান তৃতীয় বিশ্ববাদী তত্ত্বে নেই।

তৃতীয় বিশ্ববাদী পণ্ডিতরা তৃতীয় ও প্রথম বিশ্বের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ককে শোষক এবং শোষিতদের সম্পর্ক হিসেবে স্বীকার করে নেন। তারা নিজেদেরকে তৃতীয় বিশ্বের সহমর্মী বলে মনে করেন এবং প্রথম বিশ্বের বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বের ঔপনিবেশিকতা বিরোধী লড়াইয়ে একাত্মতা প্রকাশ করেন।

ইউরোপীয় চলচ্চিত্র মডেল অনুযায়ী এই ধারার লেখকরা জাতি এবং জাতীয় চলচ্চিত্রের প্রথাগত ধারণাকে প্রশ্ন করলেও তাদের আলোচনা ফরাসী, জার্মান এবং অস্ট্রেলীয় চলচ্চিত্রে সীমাবদ্ধ।

অন্যদিকে উত্তর ঔপনিবেশিকতাবাদীদের মতে, ইউরোপকেন্দ্রীক তিন বিশ্বের তত্ত্বে অ-পশ্চিমা জাতীয় চলচ্চিত্র ব্যবহৃত হয় উত্তর ঔপনিবেশিক ভূ-রাজনৈতিক বিভাজনের পুনরুৎপাদনে। উত্তর ঔপনিবেশিকতাবাদীরা 'জাতি' এবং জাতীয় চলচ্চিত্রের সংজ্ঞা দেয়া ক্রমেই দুরূহ হয়ে পড়ছে বলে মনে করেন। রাজনৈতিক পরিচয়ে একটি জাতিকে আর চেনার উপায় নেই, কারণ বর্তমান বিশ্বের বহু জাতির রাষ্ট্র কাঠামো নেই এবং অনেক রাষ্ট্রের 'জাতীয়' পরিচয় নেই। রাজু (২০০৩) উল্লেখ করছেন, এ কারণেই একজন উত্তর ঔপনিবেশিকতাবাদী সমালোচক 'জাতি'কে মনে করেন 'কোনো

নৃগোষ্ঠীর তৈরি একটি বিশেষ রকমের সাংস্কৃতিক নিদর্শন'। এই নিদর্শন তৈরি হয় বহুকাল ধরে অসংখ্য মানুষের প্রচেষ্টায়। ফিলিপ রোজেন যেমন বলেছেন, 'জাতি' জন্মায় না, তৈরি হয়। এর স্থায়ীত্বের জন্যই একে ভাঙতে হয়, গড়তে হয়, রূপান্তর ঘটাতে হয় এবং এই করে করে এর সংজ্ঞা বদলে যায়।

স্টিফেন ক্রফট্স (১৯৯৩) জাতীয় চলচ্চিত্রের অধ্যয়নে বিশ্বজুড়ে কয়েকটি ধারা চিহ্নিত করেন। বিশেষত হলিউড আধিপত্যের বিরুদ্ধে যে চলচ্চিত্র নিজ সংস্কৃতি তুলে ধরেছে সেসব চলচ্চিত্রকে তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি ইউরোপীয় আর্ট চলচ্চিত্র মডেলকে আদর্শ বলে উল্লেখ করেন। পাশাপাশি তিনি থার্ড সিনেমা, তৃতীয় বিশ্ববাদী চলচ্চিত্র, হলিউডমুখী চলচ্চিত্র, হলিউড-বিরোধী চলচ্চিত্র ইত্যাদি বিভিন্ন ধারায় কীভাবে জাতীয় চলচ্চিত্র ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবিষয়ে আলোচনা করেন (ক্রফট্স ,১৯৯৩)।

জাতীয়তা কাঠামোয় বাংলাদেশের অ্যাকশান ধারার চলচ্চিত্র

''বাংলাদেশের জনপ্রিয় সিনেমা একটি মানসম্মত, আধুনিক জাতীয় পরিচিতি (National Identity) গড়ে তোলা এবং তা ছড়িয়ে দেয়ার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্যও কাজ করছে (রাজু, ২০১৩)। এ প্রেক্ষাপটে দেখা গেলে, ১৯৬০-এর দশকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে মধ্যবিত্তের জীবন-যাপনকে পর্দায় তুলে ধরার মাধ্যমে সামাজিক ছবির জঁরা শুরু হলেও ১৯৯০ এর দশকে অ্যাকশন ধারা বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সিনেমার প্রধান ধারা হয়ে উঠলো।

বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট বিবেচনায় মাহমুদুল হোসেন চলচ্চিত্রের আপাত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন যা আমাদের জাতীয় চলচ্চিত্র সম্ভাবনায় উদ্দীপ্ত করে। সেক্ষেত্রে তিনি যেসব বিষয় উল্লেখ করেন- ভৌত আবহ (চলচ্চিত্রটি যেই স্থান এবং কাল বিবেচনায় চিত্রায়িত), সঙ্গীত, রাজনীতি এবং বাণিজ্য। একটি চলচ্চিত্র জাতীয় চলচ্চিত্র হয়ে ওঠায় এর প্রতিটি বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ। এ বিবেচনায় হোসেন (২০০৩) বাংলাদেশের চলচ্চিত্রকে দুটি কাঠামোর মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। প্রথমত, তিনি চলচ্চিত্রের ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ করেছেন। পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে নব্বই দশকের শেষ পর্যন্ত তৎকালীন রাজনৈতিক আবহ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো অনুযায়ী চলচ্চিত্রের ধারা কতটা বিকশিত হয়েছে সে বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেন।

এই গবেষণায় বাণিজ্যিক ধারার চলচ্চিত্র হিসেবে যে তিনটি চলচ্চিত্রকে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়েছে তিনটিই অ্যাকশন জঁরার চলচ্চিত্র এবং তিনটিই নায়ক-প্রধান চলচ্চিত্র। নায়ককে আমরা এখানে দেখতে পাই মাস্তান বা সন্ত্রাসী চরিত্রে, সরকার বা রাষ্ট্রবিরোধী একটি অবস্থানে।

আম্মাজান (১৯৯৯)

পরিচালক: কাজী হায়াত

বাদশাহকে কিশোর অবস্থায় রেখে মারা যান ইলেক্ট্রিশিয়ান বাবা। মা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে গেলে তাকে ধর্ষণের শিকার হতে হয়। কৈশোরে এই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে বাদশাহ সেই কর্মকর্তাকে হত্যা করে। ১৪ বছরের জেল শেষ করে ফিরে এসে কুখ্যাত সন্ত্রাসী হয়ে ওঠে।

যখনই সে কোথাও কোন ধর্ষণের খবর পায়, সেই ধর্ষককে হত্যা করে। তবে সে মায়ের আদেশ সব সময় শিরোধার্য করে নেয়। কিন্তু বাদশাহ'র মা কখনও তার সাথে সরাসরি কথা বলেন না। চলচ্চিত্রের একটি কেন্দ্র মা-পুত্রের সম্পর্ক। বাদশাহ একে একে সবাইকে হত্যা করে যারা কোনসময় তার মাকে কষ্ট দিয়েছিল। মা-এর জন্য সে সম্পদের প্রাসাদ তৈরি করে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে শহরের ত্রাসরূপে।

সাবেক সাংসদের মেয়ে রিনা। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। আমিনের সাথে তার আংটি বদল হয়েছে। বন্যার সময় ত্রাণ দেওয়ার কাজে যায় বন্ধুদের সাথে। সেখানে তাকে দেখে বাদশাহ-র মায়ের মনে হয় এমন একটি মেয়ে তার পুত্রবধূ হলে ভাল হত। বাদশাহ তা শোনার পর উপস্থিত হয় সেই সাংসদের বাসায় এবং রিনাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। এই বিয়েতে সবার অমত থাকা পরও সে জানায় যেভাবেই হোক সে রিনাকেই বিয়ে করবে।

সন্ত্রাসের জগতে বাদশাহ-র অপর প্রতিদ্বন্দী কালাম। কালাম সেই সাবেক সাংসদের কাছের লোক। এমন পরিস্থিতে সাবেক সাংসদ কালামের সাহায্য চায়। তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, মেয়েকে বিয়ে দিয়ে বিদেশ পাঠিয়ে দিবেন। এদিকে টেন্ডারসহ নানান বিষয়ে কালামের সাথে বাদশাহ-র শত্রুতা বেড়ে চলে। বাদশাহকে আটকানোর চেষ্টা করেনা তার মা, কিন্তু তিনি বলেন যে, তিনি এধরনের নৃসংশতা চান না। বাদশাহ একজন র্ধষণের শিকার নারীকে তার মা এর কাছে নিয়ে আসে এবং তার এক বন্ধুর সাথে তার বিয়ে দেয়। কিন্তু এক বোমা হামলায় সেই নারী মারা যায়। এতে কালামের সাথে শত্রুতা আরও বেড়ে যায়।

রিনা আমিনের সাথে বিদেশ চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু বিমানবন্দর থেকে তাকে উঠিয়ে নিয়ে আসে আসে বাদশাহ। সেই সূত্র ধরে কালাম এসে উপস্থিত হয় বাদশাহ-র বাড়িতে এবং বাদশাহ র মাকে গুলিবিদ্ধ করে। হাসপাতালে গোলাগুলিতে কালাম এবং বাদশাহ দু'জনই গুলিবিদ্ধ হয়। হাসপাতালে মা এবং বাদশাহ একসাথে মৃত্যুবরণ করে।

আম্মাজান চলচ্চিত্রে দেখা যায়, বাদশাহ তার নিজস্ব ক্ষমতাবলে তার একটি পৃথক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। নিজেই আইন হাতে তুলে নিচ্ছে। নিজেই বিচার করছেন। আবার তার শাস্তিও দিচ্ছেন নিজের হাতে।

শান্ত কেন মাস্তান (১৯৯৮)

পরিচালক: মনতাজুর রহমান আকবর

রায়হান মির্জা একজন সৎ উকিল। তার ছোট ছেলে শান্ত অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করে। তিনি শান্তর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। কারন শান্ত সাধারণ চাকরি করতে চায়না। এলাকার মাস্তান ছোট বোনকে উত্যক্ত করায় শান্ত রাগের মাথায় সেই মাস্তানের হাত উপড়ে তাকে হত্যা করে। শাস্তিস্বরূপ তার চার বছরের জেল হয়। শান্ত জানতে পারে ঐ মাস্তান ছিল তার বন্ধু জাফরের ছোট ভাই। সাজা শেষে বাড়ি ফিরলে রায়হান মির্জা তাকে নিজ বাসায় থাকার অনুমতি দেয়না। শান্ত বাড়ি থেকে চলে যায় বস্তিতে। সেখানে সে শীর্ষ মাস্তান হয়ে ওঠে। বস্তিতে শান্ত গরিবদের হয়ে অন্য সন্ত্রাসীদের শাস্তি দেয়। সে একটি দল গড়ে তোলে বস্তিবাসীদের নিরাপত্তা জন্য। ঘটনাচক্রে বন্যার সাথে পরিচয় হয় শান্তর। বন্যা একটি নাইট ক্লাবে নাচে।

পুরনো বন্ধু জাফরের সাথে বহুদিন পর দেখা হয় শান্তর। জাফর ততোদিনে পুলিশের কর্মকর্তা। দু'জনের সম্পর্ক থেকে সব গ্লানি দূর হয়ে যায়।

এদিকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত হয়ে পরতে হয় শান্তকে। বস্তির জমি দখল করে বিল্ডাররা বাড়ি তৈরি করতে গেলে সেই বিল্ডারের কাছ থেকে সহিংসতার মাধ্যমে জমি পুনরুদ্ধার করে শান্ত। বন্যার অসুস্থ ভাইকে ক্লিনিকে ভর্তি করে দেয় সে। বস্তিতে দুধের প্যাকেটে হিরোইন পাওয়া গেলে সেই হিরোইন ব্যবসায়ীকে হত্যা করে শান্ত। অন্যান্য সন্ত্রাসীরা শান্তকে হুমকি মনে করতে শুরু করে। এরই মধ্যে জাফরের সাথে বিয়ে হয় শান্তর বোনের।

চক্ষুশূল হয়ে ওঠায় অন্য সন্ত্রাসীরা শান্তকে মারার পরিকল্পনা করে। শান্তর বড় ভাই তা শুনে ফেলে। জেনে যায় তাদের সাথে জড়িত আছে জাফর নিজেও। জাফর অন্য সন্ত্রাসীদের সাথে একসাথে হত্যা করে শান্তর বড় ভাইকে। বহুবছর আগে ঘটে যাওয়া ছোট ভাইয়ের খুনের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জাফর শান্তকে নানানভাবে বিপর্যস্ত করে।

এক বিল্ডারকে খুনের দায়ে শান্তকে পলাতক হতে হয়; যাকে আসলে গোপনে গুলি করেছিল জাফর। সেই মামলায় জেরা করে শান্তর বাবা রায়হান মির্জাকেও হেনস্থা হতে হয় জাফরের কারণে। জাফর সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রকাশিত হলে তাকে শান্তর মামলা থেকে অব্যহতি দেওয়া হয়। সেজন্য জাফর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে মারার পরিকল্পনা করে। শান্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আহত অবস্থায় অপহরণ করে। এদিকে জাফরের হাতে খুন হয় শান্তর বোন। অবশেষে শান্ত জানতে পারে জাফরই আছে সব ষড়যন্ত্রের মূলে। সবশেষে জাফরকে গুলি করার মুহূর্তে রায়হান মির্জা নিজেই জাফরকে গুলি করে। এবং শান্তকে আপন করে নেয়। সুস্থ হয়ে ওঠা মন্ত্রীও পুলিশের কাছে সাক্ষ্য দেন শান্তর পক্ষে।

চলচ্চিত্রের শুরু থেকে রায়হান মির্জা অনেকটাই রাষ্ট্রের প্রতীক হয়ে ওঠেন। আদর্শ, সততা, নিষ্ঠা এই গুণ তিনি তার ছেলেদের মধ্যেও দেখতে চান। অন্যদিকে বস্তিতে শান্ত নিজের একটি আদালত তৈরি করে। এর মধ্য দিয়ে তার সব অপকর্মকে সে প্রতিষ্ঠিত করে।

ছবির শেষ দৃশ্যে শুধু রায়হান মির্জা শান্তকে আপনই করে নেয়না, প্রকৃতঅর্থে পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থা একজন হত্যাকারী অপরাধীকে আপন করে নেয়। চলচ্চিত্রটিতে খলনায়ক হিসেবে আমরা দেখেছি পুলিশের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে। যেহেতু রাষ্ট্রের এমন আর কোন যন্ত্র নেই যা অপরাধীকে শাস্তি দেয় অথবা দুর্ঘটনায় ভুক্তভোগীদের পাশে এসে দাঁড়ায়, সেই প্রেক্ষিতে শান্তকে মাস্তানের রূপে এগিয়ে আসতে হয়। তদুপরি বিষয়টিকে আরও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একজন মন্ত্রী সাক্ষ্য দেয় যে শান্ত নিরাপরাধ।

মিথ্যার রাজা (১৯৯৬)

পরিচালক: কমল সরকার

মুক্তিযুদ্ধের ধারাভাষ্যের মাধ্যমে চলচ্চিত্র শুরু হয়। বিজয় দিবস উদ্‌যাপন চলছে একটি স্কুলে। স্কুলের শিক্ষক হায়াত রাজাকারদের চিহ্নিত করার উল্লেখ করে স্কুলের শিশুদের সামনে। রাজাকার শিকদারের লোকেরা হায়াতকে মিথ্যা অপবাদে পুলিশে ধরিয়ে দেয়। কারাদন্ডের আদেশ দেওয়ার পর হায়াত আদালতের বারান্দা থেকে লাফিয়ে পরে আত্মহত্যা করে। তার ছেলে রাজা বাবার মরদেহ নিয়ে তা ভুলে না যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করে।

পনের বছর পর, রাজা বড় হয়ে আদালতে আসে অন্য একটি মামলার সাক্ষী হয়ে। কিন্তু সে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। এদিকে রাজার বোন তমার ব্রেন টিউমার ধরা পরে। বোনকে রাজা বলে সে বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আদালতে মিথ্যা কথা বলে।

রাজাকে এলাকার মাস্তান রাজাকার হিটলারের পাচার করা হিরোইন লুট করার কাজ দেয়। রাজা তা লুট করে এবং শিকদারকে জানায় রমজান এই ঘটনায় বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। রমজানই একসময় তার বাবার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল, যেকারণে রাজা তার প্রতিশোধ নেয়। তাছাড়া, রাজার বাবার বিরুদ্ধে যে উকিল মিথ্যা ওকালতি করেছিল তাকেও রাজা হিটলারের লোকদের মাধ্যমে শাস্তি দেয়।

এর পাশাপাশি আমরা আরেকটি গল্প ছবিতে দেখতে পাই। রাজার বাবা হায়াত-এর বন্ধু আসাদ; যিনিও হায়াতের সাথে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেন। আসাদের মেয়ে শাওন হিটলারের ছেলেকে ভালবেসে বিয়ে করতে চায়। আসাদ নিজের মনের বিরুদ্ধে হিটলারের কাছে প্রস্তাব নিয়ে গেলে হিটলার তা ফিরিয়ে দেয়। এই ঘটনার জের ধরে

বিষ খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয় হিটলারের ছেলে সাগর। ডাক্তারের কথামতো আসাদের রক্তের গ্রুপ আর সাগরের রক্তের গ্রুপ এক হওয়ায় হিটলার আসাদের কাছে ক্ষমা চায় এবং তাকে রক্ত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে। শাওন এবং সাগরের বিয়ে হয়। কিন্তু এই বিয়ে ভেঙে দিতে চায় হিটলার। বোনের চিকিৎসার জন্য অর্থ প্রয়োজন হয় রাজার। হিটলারের কথায় শাওনকে মিথ্যা বলে রাজা যেন শাওন সাগরকে ছেড়ে চলে যায়। ঘটনাচক্রে শাওন পাচারকারীদের কবলে পরে। এদিকে রাজার বোন মারা যায়। রাজা শাওনকে উদ্ধার করে তার বাবার কাছে ফিরিয়ে দেয়।

বিজয় দিবসে রাজাকার হিটলার পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানের সভাপতি। পতাকা উত্তোলনের আগে সে যখন নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা বলে দাবি জানায়, রাজা এসে তার মুখোশ খুলে দেয়। জনগণ হিটলারের বিরুদ্ধে ক্ষেপে যায় এবং জুতা ছুড়ে মারে। শেষ পর্যায়ে পুলিশ এসে উপস্থিত হয় এবং হিটলারকে গ্রেফতার করে।

মিথ্যার রাজা ছবিতে বাংলাদেশে স্বাধীনতা বিরোধীদের দৌরাত্ব এবং তারা যে এখনও নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে কাজ করছে সে বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু গল্পটি অনেক খেলোভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া সিনেমার নায়ক রাজাকে একজন প্রতিশোধ পরায়ণ যুবক হিসেবেই দেখানো হয়। কিন্তু সে প্রতিশোধ নিতে তাকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। তাকে সন্ত্রাসের আশ্রয় নিতে হয়।

আলোচনা

ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ধারণা নির্মাণঃ

ঔপনিবেশিক আমলে রাষ্ট্রকে বিবেচনা করা হতো ক্ষমতার একক কেন্দ্র হিসেবে। একই সাথে জনগণের অবস্থান থেকে এবং বিদ্যমান তখনকার রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে মনে করা হতো উৎপীড়নের যন্ত্র হিসেবে। যদিও আমরা আধুনিক রাষ্ট্রের ধারনায় দেখি, জনগণকে ক্ষমতার মূল উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গবেষণায় ব্যবহৃত চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রকে উপনিবেশিক রাষ্টের কাঠামোয় দেখানো হয়েছে। 'মাস্তান' চরিত্রগুলো সে কারণেই প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রবিরোধী উপাদান হলেও তাদের সাথেই দর্শক একাত্মতা অনুভব করে।

বাদশাহ, শান্ত বা রাজা- তাদের মধ্য দিয়ে যে সংস্কৃতি নির্মাণ করা হয় সেখানে তারা 'মাস্তান' বা রাষ্ট্রবিরোধী উপাদানের পরিবর্তে হয়ে ওঠে সমাজের বা জাতির প্রতিনিধি। *শান্ত কেন মাস্তান* ছবিতে তাই দেখা যায়, 'মাস্তান' শান্তকে নিজেদের রক্ষার জন্য অনুরোধ জানায় একটি বস্তিতে বসবাসকারী মানুষ। কার্যত রাষ্ট্রের কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করেন না না তারা। তাই তো দুর্বত্তদের আক্রমন থেকে বাঁচার জন্য এক কিশোরী ছবির নায়ক শান্তর হস্তক্ষেপ কামনা করে। 'আমি যদি শান্তর মত একজন ভাই পাইতাম'- কিশোরীর এই আক্ষেপের মধ্যে রাষ্ট্রের বিপরীতে বিকল্প রক্ষাকর্তার জন্য আর্তি ফুটে উঠেছে। উপনিবেশিক রাষ্ট্রে জনগণ যেমন রাষ্ট্র থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন

থাকে এখানেই তাই নির্মিত হতে দেখা যায়। ফলে 'জাতি' এবং 'জাতি-রাষ্ট্র' দুটি বিচ্ছিন্ন প্রত্যয়ে পরিণত হয়।

দূর্বল রাষ্ট্র কাঠামোঃ

চলচ্চিত্রে প্রদর্শিত সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্রকে আমরা রক্ষকের ভূমিকায় দেখতে পাইনা। প্রতিটি চলচ্চিত্রে নায়ক রাষ্ট্রের আইন ও শাসন ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে নিজের একটি আইন কাঠামো নির্মাণ করেন। *আম্মাজান* ছবিতে তাই দেখা যায় নায়ক বাদশাহ রাষ্ট্রের কোন শাসনকাঠামোকে গণ্য করেন না। বরং নিজেই অপরাধীকে শাস্তি দেন। একইভাবে *শান্ত কেন মাস্তান* ছবিতে নায়ক 'মাস্তান' শান্ত রাষ্ট্রীয় আদালতের বাইরে প্রতিষ্ঠা করেন বিকল্প আদালত। তার ভাষায়, ''আমার আদালত মানে জনগণের আদালত। জনগণ যা রায় দিবে তা কার্যকরী করা হয়''।

প্রতিটা চলচ্চিত্রে দেখা যায়, নায়করা একের পর এক অপরাধ করে যাচ্ছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা তার কিছুই করতে পারেনা। যেহেতু নায়ককে এখানে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী-কাঠামোর প্রতিনিধিরূপে পরিবেশন করা হয়, সে কারণে দর্শকের কাছে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বাইরে ব্যক্তি নির্মিত এই শাসন ব্যবস্থাই বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায়। *শান্ত কেন মাস্তান* ছবিতে নায়ক যখন দম্ভের সাথে উচ্চারণ করেন, "আমি মাস্তানি করি আমার মানুষের জন্য। আমি কোন অন্যায় করিনা"- এর মধ্য দিয়ে কার্যত একটা অকার্যকর রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবিই নির্মিত হয়।

মিথ্যার রাজা ছবির শুরুতেই ধর্ষন মামলার যে দৃশ্যায়ন করা হয়েছে তাতে আদালতের অনেক সীমাবদ্ধতা ফুটে উঠে। কেবল একজন স্বাক্ষীর জবানবন্দীর মাধ্যমেই মামলার রায় দিয়ে ফেলেন বিচারক। কোন ধরণের পুলিশি তদন্ত (অভিযোগ) ও ময়নাতদন্ত আমলে নেয়া হয় নি।

একই ভাবে *শান্ত কেন মাস্তান* ছবিতেও বিচার প্রক্রিয়াকে দেখানো হয় খুব 'খেলো'ভাবে। ছবিতে নায়ক শান্ত যখন খুনির মামলার আসামী হয়, সে মামলায় নায়কের বাবা স্বাক্ষ্য দিতে এসে কার্যত বিচার ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাকেই তুলে ধরেণ। তিনি যখন বলেন, 'অথর্ব বিচার ব্যবস্থা' সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে তখন এটাই বোঝা যায় যে, রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন আদালতে তারা আস্থা রাখতে পারছেন না। প্রশ্ন তোলেন, শান্তরা কেন মাস্তান হয়ে উঠেন? কার্যত রাষ্ট্রের অকার্যকারিতাকেই দায়ী করেন তিনি।

অন্যদিকে *আম্মাজান* ছবিতে জাতি রাষ্ট্রের আপত অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এ ছবিতে বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা দেখানো হয়েছে। এই ছবিটি নিয়ে করা এক গবেষণায় রাজু (২০১৩) দেখিয়েছেন, কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়নি। তার মতে, ''পর্দায় জাতি রাষ্ট্রকে অদৃশ্য রাখার এই প্রবণতা দুইটি সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে। যার প্রথমটি, ধরে নেয়া যায় যে, বিশ্বায়নের কারণে বাংলাদেশের মতো

অ-পশ্চিমা জাতি রাষ্ট্রগুলোতে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো আগের চেয়ে দূর্বল হয়ে যাচ্ছে এবং অন্যান্য অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো (যেমন আম্মাজান সিনেমায় গ্যাংস্টার) সবল হয়েছে।"

মিথ্যার রাজা ছবিতে অন্যতম প্রধান ভিলেনের চরিত্রে দেখা যায় একজন পুলিশ অফিসারকে। আর *আম্মাজান* ছবিতে কিছু দৃশ্যে পুলিশবাহিনীর যে কার্যক্রম দেখানো হয় তাতে রাষ্ট্রের দুর্বলতাই প্রকাশিত হয়। অপরাধী কে সেটা জানা থাকা সত্বেও পুলিশ থেকে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় না। অপরদিকে পৌরসভা চেয়ারম্যানকে দেখানো হয় ধর্ষকরূপে। এর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অসরতা ও দূর্বলতাই তুলে ধরা হয়েছে।

জেলখানোকে সাধারণত ধরা হয় সংশোধণাগার হিসেবে। অপরাধীরা এখানে শুধু শাস্তিই ভোগ করেন না, একই সাথে এখানে সংশোধনের একটি প্রক্রিয়াও চলে। কিন্তু *আম্মাজান* ও *শান্ত কেন মাস্তান* দুটি ছবিতেই দেখা যায় কারাদন্ড ভোগ করার পর (একটিতে চার বছর ও একটিতে ১৪ বছর) জেলখানা থেকে বের হয়ে তারা আরো বড় 'সন্ত্রাসী' হয়ে উঠছেন। এই ঘটনা আমার বিচার ব্যবস্থার সাথে জেলখানার (কার্যত সংশোধণাগার) অকার্যকারীতা প্রমান করে।

রাষ্ট্রব্যবস্থা যেমন তার নাগরিকদের শৃঙ্খলার (শৃঙ্খল) মধ্যে রাখতে চায়, যেমনটা আমরা আলথুসারীয় নিপীড়ণবাদী তত্ত্বেও দেখতে পাই, ঠিক সেভাবেই (*শান্ত কেন মাস্তান* ছবিতে) রায়হান মির্জা তার সন্তানদের একটি নিয়মের মধ্যে রাখতে চান। কিন্তু সেই রায়হান মির্জাকেই আবার সিনেমার শেষভাগে বলতে দেখা যায়, জানোয়ারকে মারতে হলে জানোয়ারই হতে হয়। এর মধ্য দিয়ে একটি রাষ্ট্রবিরোধী ব্যবস্থাকে , যেটি আবার কার্যত জনগণমুখী, স্বীকৃতি দেয়া হয়।

সহিংস সংস্কৃতি নির্মাণঃ

গীতি আরা নাসরিন ও ফাহমিদুল হক (২০০৮) তাদের এক গবেষণায় রিচার্ড ডায়ার-এর একটি গবেষণা প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। হলিউড ছবির সহিংসতা উল্লেখ করে ডায়ার দেখিয়েছেন, রোলার স্কেটের গতিসম্পন্ন এই ছবিগুলোতে কাহিনীর পরিবর্তে থাকে শুধুই গোলাগুলি ও হত্যাকান্ড। কত জন মৃত্যু বরণ করলো সেটা গণনা করার মতো সময়ও দর্শককে দেয়া হয় না। বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত চলচ্চিত্রসমূহ এই বিষয়টিকেই পূনরায় উপস্থাপিত করেছে।

মিথ্যার রাজা ছবিতে নায়ক বাবার হত্যা ও অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বিভিন্ন ছলে জড়িতদের কারো হাত কেটে নিচ্ছেন, কারো বা জিহ্বা। আবার *শান্ত কেন মাস্তান* ছবিতে দেখা যায় বোনের উপর যৌন নিপীড়নের প্রতিশোধ নিতে প্রকাশ্যেই নিপীড়নকারীর হাত কেটে নিচ্ছেন, এমনকি তাকে মেরেও ফেলা হয়। কিন্তু এই

কাজকেও তিনি নায্য মনে করছেন অন্যায়ের প্রতিবাদ হিসেবে। চার বছর কারাদন্ড ভোগ করার পর যখন বাড়ি ফিরলেন তখন বাবার প্রশ্নের জবাবে জানালেন, তিনি কোন অন্যায় করেন নি। *আম্মাজান* ছবিতেও দেখা যায় এরকম অনেক সহিংস দৃশ্য। *আম্মাজান* ছবিতেও দেখা যায় এরকম অনেক সহিংস দৃশ্য। বাদশাহ যখনই কোন ধর্ষণের খবর জানতে পারে, প্রতিবারই সে সেই ধর্ষককে খুঁজে বের করে হত্যা করে। বারবারই অত্যন্ত নৃসংশ এই হত্যাদৃশ্য দেখানো হয় পর্দায়। এমনকী পুলিশ কর্মকর্তাদের বলতে দেখা যায় যে, বাদশাহ তো অপরাধীকেই শাস্তি দিচ্ছে, সেক্ষেত্রে কীভাবে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যায়।

তবে, দর্শকের কাছেও এ মৃত্যু আলাদা কোন অর্থ বহন করে না। বরং নায়কের এই বীরকর্মে পূর্ন সমর্থন থাকে তাদের। রাষ্ট্রের বিচারকার্যের চেয়ে এই সহিংসতাকেই এক বিকল্প রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নেয় দর্শক।

বিভক্ত জাতীয়তা কাঠামো:

মুক্তিযুদ্ধ ব্যতীত কোন জাতীয় গৌরব বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হতে দেখা যায় না। এমনকী মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্র করে যা প্রদর্শিত হয়েছে তা-ও অত্যন্ত গতানুগতিক। সেখানে ইতিহাস অথবা ঐতিহাসিক কোন ব্যক্তির প্রতিফলনও অনুপস্থিত। একটি বহুত্ববাদী সমাজব্যবস্থার প্রতিফলনও চলচ্চিত্রগুলো উপস্থাপন করেনা । সংস্কৃতি তাত্ত্বিক হল (১৯৯৩) জাতি-সত্তার নির্মাণের দ্বিতীয় পর্যায়ে উল্লেখ করেছেন জাতি-সত্তার রূপান্তরের বিষয়টি। রূপান্তরের মধ্য দিয়ে একটি আধুনিক জাতি-সত্তায় পরিণত হওয়ার বিষয়টিতে জোর দিয়েছেন হোমি ভাবা (১৯৯৪) -ও। আর এই রূপান্তরের পথে বিভিন্ন উপাদান জাতীয়তাকে আরও সমৃদ্ধ করে বলে তারা দাবি করছেন। কিন্তু চলচ্চিত্রগুলো বিশ্লেষণে এরূপ কোন সমৃদ্ধ জাতীয়তা দেখা যায় না। বরং একটি বিভ্রান্ত ও বিভক্ত জাতি-সত্তার চিত্র প্রতিফলিত হয়।

মিথ্যার রাজা ছবির শুরতেই মুক্তিযোদ্ধা হাসান মাস্টার স্বাধীনতাবিরোধীদের বিরুদ্ধে যে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের কথা বলেন, তা সিনেমায় আর দেখা যায়নি। আর একই সাথে একটি সাজানো অভিযোগে সাজা হওয়ার পরে তাঁর (মুক্তিযোদ্ধা হাসান মাস্টার) আত্মহত্যা দিয়ে এই সমাজের প্রতি ঘৃণা ও হতাশা প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান রাজার চরিত্রের মাধ্যমেও আসলে এটারই প্রকাশ ঘটে যে, পুরো সমাজব্যবস্থা আসলে স্বাধীনতাবিরোধীদের দখলে। সেখানে ন্যায়ের লড়াইয়ের কোন সুযোগ নেই। অথচ আমরা জানি, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন, শোষন আর বৈষম্য এবং তাদের চাপানো অন্যায় আক্রমনের বিরুদ্ধে একটি ন্যায় সংগত সশস্ত্র জনযুদ্ধের মধ্য (সম্মিলিত সংগ্রামের মাধ্যমে) দিয়ে বাংলাদেশ নামের একটি জাতিরাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। অথচ এখানে সেই চেতনাকে তুলে ধরার কোন প্রয়াস বা চেষ্টা দেখা যায়নি। একজন রাজা অনেকটা বিচ্ছিন্ন সত্তা।

হয়তো এমন সমালোচনা কেউ তুলতেই পারেন যে, বাস্তবতাই তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু একটা খন্ডিত বাস্তবকে সমগ্র হিসেবে তুলে ধরার এই চেষ্টা আমাদের জাতীয় গৌরব মুক্তিযুদ্ধকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। আমাদের দীর্ঘ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের যে সমৃদ্ধ ইতিহাস তার ধারাবহিকতা এ ধরনের সিনেমায় দেখা যায়না। বরং এটাই প্রমান করে যে, একটা হতাশাগ্রস্ত জাতি তার রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন। তার অতীত সাংস্কৃতিক লড়াই থেকে দূরে সরে আছে। তার বর্তমান তার চেতনার বিপরীতে অবস্থান করছে। সর্বোপরি এই জাতির তার চিন্তা, দর্শন ও সংস্তৃতিতে ভীষণ অনৈক্য বিদ্যমান। আছাড়া একটা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে বৈচিত্রের পারস্পরিক যে সহনশীল অবস্থান থাকা জরুরী, সেটাও অনুপস্থিত।

পুরুষতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো:

চলচ্চিত্র গবেষক রাজু (২০১৩) বলছেন, বাংলাদেশের জনপ্রিয় অ্যাকশন ধারার ''সিনেমাগুলোর অধিকাংশকে যৌনযুদ্ধের খেলাঘর/খেলার মাঠ হিসেবে দেখা যায়, যেখানে শক্তিশালী ঘাতক নায়ক এবং কোমল আক্রান্ত নায়িকা হিসেবে চিত্রিত হয়।''

এই গবেষণায় ব্যবহৃত ছবিগুলোতেও তেমন দেখা গেছে। *আম্মাজান* ছবিতে দেখা যায় প্রচলিত নিয়ম কানুন বা গণতান্ত্রিক রীতিনীতির তোয়াক্কা না করেই মায়ের ইচ্ছাকে মূল্য দিতে রিনাকে বিমানবন্দর থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসে আসে বাদশাহ। নায়কের ইচ্ছাটাই এখানে মূখ্য। বাকি যে কারো, বিশেষ করে নারীর মতের কোন মূল্য নেই।

একইভাবে দেখা যায়, *মিথ্যার রাজা* ছবিতে, শাওন নামের এ নারীকে পাচারকারীদের হাত থেকে রক্ষা করতে তার প্রেমিকাকে (প্রেমিকার ইচ্ছায় বটে) সেখানে রেখে আসে নায়ক। এখানে নারীর নিরাপত্তা, সম্মান কোন বিষয়কে পাত্তা দেয়া হয়নি। আর সব ছবিতেই একাধিক ধর্ষণ/ ধর্ষণ চেষ্টার দৃশ্য আছে যেখানে নায়িকা আক্রান্ত এবং নায়ক কখনও রক্ষা কর্তার ভূমিকা বা কখনও প্রতিশোধ নেয়ার ভূমিকা পালন করেছেন। *মিথ্যার রাজা* ছবিতে দুটি গুরুত্বপূর্ন বাবার চরিত্র থাকলেও মায়ের কোন চরিত্রই ছিল না। *শান্ত কেন মাস্তান* ছবিতে পরিবারে বাবার ভূমিকা ছিল অনেকটা শাসনকর্তার ভূমিকায়।

তাছাড়া, তিনটি ছবিতেই নারীর সাথে ঘটা যৌন নিপীড়নকে সনতান শব্দসমূহ দ্বরাই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন: ইজ্জত, সম্ভ্রম, নারীত্ব প্রর্ভতি। *শান্ত কেন মাস্তান* ছবিতে তাই নায়ককে তার বোনকে উদ্দেশ্য করে বলতে শোনা যায়, ''তোর ইজ্জত বাঁচাতে গিয়ে আমার যদি ফাঁসিও হয়, তা হাসিমুখে মেনে নেব।''

স্ত্রীর ভূমিকাও দেখা যায় সমাজের সনাতন জেন্ডার ভূমিকার আদলে। *মিথ্যার রাজা* ছবির খলনায়ক হিটলারের ছেলে সাগর যখন 'নষ্টামির' দায়ে স্ত্রীকে ঘর থেকে বের করে দেন, তখনও তার স্ত্রী স্মামীর কাছে আর্জি জানান, 'আমি তোমার স্ত্রী, তোমার পায়েই আমার সুখ।''

অতএব, তিনটি ছবিতেই সক্রিয়/ত্রানকর্তা পুরুষ ও অক্রিয়/আক্রান্ত নারী চরিত্র নির্মানের মধ্য দিয়ে সমাজের সনাতন জেন্ডার ভূমিকাই পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়েছে, যা মূলত রাষ্ট্রের পুরুষতান্ত্রিক অবস্থানকেই নির্দেশ করে।

'বাঙালি মুসলমানের' আধিপত্যবাদী রাষ্ট্র

গবেষণায় আলোচিত তিনটি ছবির বিশ্লেষণেই দেখা যায়, এর চরিত্র, সংলাপ, সংগীত, পোশাক পরিচ্ছেদ বাঙালি মুসলমানদের তুলে ধরেছে। কোন চরিত্রই এসব ছবিতে ছিল না যারা সমাজের অন্যান্য ভাষাভাষী, অন্যান্য ধর্মের মানুষকে তুলে ধরেছেন। এতেই এটাাই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ বাঙালি জাতিসত্তার পাশাপাশি একটি মুসলিম রাষ্ট্র।

চলচ্চিত্র গবেষক রাজু (২০১৩) তার এক গবেষণায় যেমনটি বলেছেন, "রাষ্ট্র এবং মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলমানদের অব্যাহত প্রয়াসে বাংলাদেশের জনপ্রিয় সিনেমায় বাংলাদেশকে একটি বাঙালি মুসলমান রাষ্ট্র হিসেবে যেভাবে প্রদর্শণ করা হয়, সেটা স্পষ্টভাবে অ-মুসলিম, অ-বঙালি, এবং বাংলাদেশের পাহাড়ি গোষ্ঠীর মতো সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোর সাংস্কৃতিক পরিচিতিকে খাটো করে দেখার চেষ্টা"। ফলত, বহু ভাষা, ধর্ম এবং জাতির একটি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের কোন পরিচিত নির্মিত তো হয়-ই না, বরং শুধুমাত্র বাঙালি মুসলমান চরিত্রের শক্তিশালী উপস্থাপন সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্যকেই তুলে ধরে।

উপসংহার

উত্তর-উপনিবেশবাদ সংস্কৃতি এবং সমাজের উপর উপনিবেশের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে। ঔপনিবেশিকতা বিরোধী তাত্ত্বিক ফ্র্যান্টজ ফ্যানন উপনিবেশবাদের জটিল মনস্তত্ত্বগত পরিণাম উপস্থাপণ করেন। উপনিবেশবাদ একটি জাতিকে তার সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে পশ্চাদপদ করে। বাণিজ্যিক ধারার এই ছবিসমূহ মূলত এই প্রতিপাদ্যটিকেই পুনর্নির্মাণ করে। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিপর্যস্ত নায়ক যখন সাম্রাজ্য তৈরি করে সেটাই তখন হয়ে ওঠে রাষ্ট্রের প্রতীক। ঔপনিবেশিক অনুগত আরেকটি রাষ্ট্র কাঠামো সেখানে অদ্ভুত কিছু নয়, বরং স্বাভাবিক। প্রতিটি নমুনা ছবি বিশ্লেষণে দেখা যায় জাতি এখানে রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন একটি সত্ত্বা। ফলে জাতীয় সংস্কৃতি নির্মাণ নয় বরং এক অনুগত ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কাঠামো যেটি আবার রাষ্ট্র হিসেবে ভীষন দূর্বল, সহিংস, পুরুষতান্ত্রিক, জাগিগতভাবে বিভক্ত ও ধর্ম ও ভাষার ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্যমূলক।

তথ্যসূত্রঃ

Ahmed, A. F. Salahuddin (2000), *Bengali nationalism and the emergence of Bangladesh, an introductory outline,* Dhaka, UPL.

Anderson, Benedict (1983), *Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism*, London, Verso.

Bhabha, Homi K(1994), DissemiNation: Time, narrative and the margins of the modern nation, *The location of Culture*, London, Routledge.

Burton, G. (2005), Media Texts; Features and Deconstructions, *Media and societ:Critical perspectives*,(1st edition, 45-79), Berkshire, Open Univeristy Press.

Crofts, Stefen, (2006), Reconceptualising National Cinema, ed Valentina Vitali & Paul Willemen, *Theorising National Cinema*, (1st edition, 44-58) British Film Institute, London.

Ezra, Elizabeth (1983), *National Cinemas in the Global Era*, [pdf version] Retrieved from https://dspace.stir.ac.uk/bitstream/1893/527/1/Ezra-NationalCinemasinGlobalEra-CinemaBook.

Fanon, Frantz, (1963), *The wretched of the earth*, New York, Grove Press.

Hall, Stuart, (1997), The Work of Representation", In Stuart Hall, *Representation: Cultural Representation and Signifying Practices*,(1st edition, 6-34), Sage publications & Open University, London.

Hall, Stuart, (1990), Cultural Identity and Diaspora, [e-pdf version] In Jonathon Rutherford, *Identity: Community, Culture, Difference*, (222-238), Retrieved from https://epdf.pub/identity-community-culture-difference.html

Jahangir, B. K, (2002), *Nationalism, fundamentalism and democracy in Bangladesh*, Dhaka, UPL.

Monaco, James (2000), *How to read a film*, Oxford, Oxford University Press.

Raju, Zakir Hossain, (2015), *Bangladesh cinema and national identity: in search of the modern?* London, Routledge.

Rose, Gillian, (2001), *Visual methodologies*, London, Sage.

Rosen, Philip (2006), History, Textuality, Nation: Kracauer, Burch and Some Problems in the Study of National Cinema, In Vitali V., & Willemen P, *Theorising National Cinema*, (1st edition, 17-28), London, British Film Institute.

Schendel, Willem Van & Weetergaard, Kirstern (1997), *Bangladesh in the 1990s, Selected studies*, Dhaka, UPL.

কাদের, মির্জা তারেকুল (১৯৯৩), *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি।

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (২০১১), *বাঙালির জাতীয়তাবাদ*, ঢাকা, ইউপিএল।

নাসরিন, গীতি আরা ও হক, ফাহমিদুল (২০০৮), *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প: সংকটে জনসংস্কৃতি*, ঢাকা, শ্রাবণ প্রকাশনী ।

ফ্যানন, ফ্রান্টজ (২০১১), জাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে, সম্পা.ফকরুল চৌধুরী, *উপনিবেশবাদ ও উত্তর-ঔপনিবেশিক পাঠ*, (২২-৩৫) , ঢাকা, আগামী প্রকাশনী।

রাজু, জাকির হোসেন (২০০৩), 'জাতি' প্রশ্নের আলোকে জাতীয় চলচ্চিত্রের ধারণা, *দৃশ্যরূপ সংকলন১৪১০*, ৩৩-৪০।

রাজু, জাকির হোসেন (২০১৩), বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সিনেমা: জঁরা ও জাতীয়তার বন্ধনে, *যোগাযোগ*, সংখ্যা ১১, ৮৩-৯০।

হক, ফাহমিদুল ও ভৌমিক, প্রণব (২০১৪), *তারেক মাসুদ, জাতীয়তাবাদ ও চলচ্চিত্র*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী।

হোসেন, মাহমুদুল (২০০৩), জাতীয় চলচ্চিত্র: পরিপ্রেক্ষিত ও সম্ভাবনা, *দৃশ্যরূপ*,সংকলন ১৪১০, ১-৩২।